ইকুইটিবিডি অবস্থান পত্র

ওগখ্ব শর্ত পুরণে প্রণীত মুল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আইন-২০১২, একটি পর্যালোচনা

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বনাম দরিদ্র বান্ধব রাজস্ব আদায় কৌশল

১. উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজস্ব আদায় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাহরণ একটি গুরুত্বপুর্ণ কৌশল

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র একটি দেশ। আমাদের দেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ফেলার চেষ্টা করা হলেও কিন্তু বাস্তবে চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। এখনও বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান এবং মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ৪০% দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, কর্মসক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০% বেকার। মাথাপিছু জিডিপি ৮০০ ডলার হিসাব করা হলেও ক্রমবর্ধমান ও তীব্র আয় বৈষম্যের কারণে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্ঠিমেয় কিছু লোকের হাতে, যারা মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫% বা তারও কম। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী মধ্য আয়ের দেশ হতে হলে একটি দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৪,০০০ ডলারের কাছাকাছি হতে হবে। অর্থাৎ ৪,০০০ ডলার আয় করার অর্থই হলো ঐ দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা থাকবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে, আয়-বৈষম্য কমে আসবে, শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাংখিত মান অর্জনে সক্ষম হবে। সুতরাং এসকল সমস্যা কাটিয়ে উঠে আগামী কত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। উন্নয়নশীল বা মধ্য আয়ের দেশের খাতায় নাম লেখাতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকারও তার রূপকল্প "ভিশন-২০২১" সম্পর্কে বলেছেন দারিদ্র্য দুরীকরণে আগামী দিনগুলোতে জিডিপি'র ৩৫% পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ কোথায় পাওয়া যাবে। সরকারের জন্য এক্ষেত্রে দু'টি উৎস খোলা রয়েছে। এর একটি হচ্ছে বৈদেশিক উৎস অর্থাৎ ঋণ এবং অপরটি হচ্ছে রাজস্ব আদাযের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য অর্থের সংস্থান। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ভাবতে হবে বৈদেশিক ঋণ দিয়ে আসলে আমরা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারব কি না।

স্বাধীনতাত্তোর কালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে ব্যাপক বৈদেশিক সাহায্য (বিশেষ করে অনুদান) পাওয়া

evsjv‡`‡k ^e‡`wkK mvnvh¨ cevn wPÎ (wgwjqi Wjvi)

A_eQi	Ab`vb	FY	‡gvU	wRwWwc %
72-23	486	60	546	8%
79-80	650	572	122	
89-90	765	1043	1808	6.7%
2001-02	190	1006	1196	3.6%
2008-09	37	1022	1059	3.5%
2009-10	88	1477	1565	1.2%

Z_¨ mÎt ewnt m¤ú` cevn-2009, evsjv‡`k e¨vsK ^ÎgwmK wi‡cvU-gvP 11

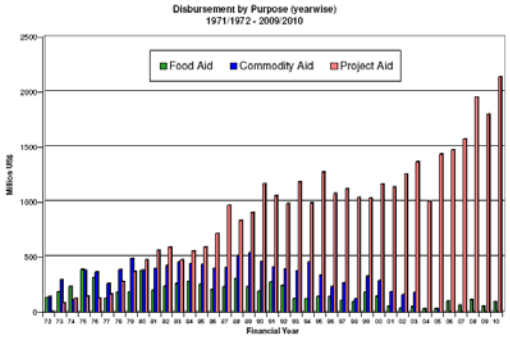

গেলেও ৮০'র দশক থেকে এর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ জিডিপি'র ৮-৯% হলেও ২০০৯-১০ সালে এর পরিমাণ এসে দাঁড়ায় জিডিপি'র মাত্র ১.২%। অধিকন্তু, অতীতে

বৈদেশিক সাহায্যসমূহ অনুদান আকারে পাওয়া গেলেও বর্তমানে তা গ্রহণ করতে হচ্ছে ঋণ আকারে এবং এগুলো অবার শর্তযুক্ত। এসকল শর্তযুক্ত ঋণ বেশীর ভাগই দেশের কাংখিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ঋণ প্রাপ্তিও অনিশ্চিত। অনিশ্চিত এবং অসময়োপযোগী ঋণ বা সাহায্য প্রাপ্তির কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যাবলী নির্ধারণ করা যায় না এবং কোন প্রকল্পই সময়মত বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বরং সেক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং গতিশীল রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাহরণ কৌশল অধিকতর কার্যকর হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যান্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করা গেলে সরকারের পক্ষে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে, যা বৈদেশিক উৎসের দ্বারা সম্ভব নয়। রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব হলে সরকারের পক্ষে বৈদেশিক ঋণের ক্ষতিকর শর্তসমূহ চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে, তাছাড়া এক্ষেত্রে জনগণের কাছে সরকারের যে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও জবাবদিহিতার বিষয়টি রয়েছে সেটাও অনেকাংশে নিশ্চিত করা যাবে।

এটাও সত্য যে, এই বৈশ্বিক যুগে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে রাষ্ট্রের নিজস্ব বিনিয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিয়োগও নিশ্চিত করা দরকার। কারণ বাংলাদেশের মতো স্বল্প সম্পদের অধিকারী দেশের পক্ষে সত্যিকার অর্থেই প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দুরীকরণ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের জন্য কর ভিত্তি সম্প্রসারণও একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সরকার এক্ষেত্রে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় কর সুবিধা প্রচলন করে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারেন। এতে একদিকে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে শিল্পায়ন ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যে কোন দেশের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। কর ব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ প্রক্রিয়া গতিশীল করতে হলে সেখানে জনগণের অংশগ্রহণ উক্ত প্রক্রিয়ার মৌলিক অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বের একটি অংশ, সুতরাং একটি জনঅংশগ্রহণমুলক রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা

অবশ্যই সম্পদ সমাহরণের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি।

২. আমাদের অর্থনীতির আয়তন এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রসমুহ

জনসংখ্যার দিক দিয়ে বড় হলেও আয়তনের দিক দিয়ে ছোট এবং দরিদ্র দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়তন খুব একটা বড় নয়। এক সময় অর্থনীতির মুল চালিকা শক্তি কৃষি হলেও বর্তমানে কৃষির পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতের ক্রমবর্ধমান অবদান লক্ষণীয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মোট পরিমাণ বা জিডিপি হচ্ছে ৯,১৪,৭৮৪ কোটি টাকা। এই জিডিপি'র মধ্যে কৃষির অবদান ২০.১৬%, শিল্পের অবদান ২৯.৯৫% এবং সেবা খাতের অবদান ৪৯.৯০%। জিডিপিতে কৃষি ও শিল্পের অবদান কাছাকাছি থাকলেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান খুবই নগণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কৃষি কাজে এখনোও দেশের প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী জড়িত, যে কারণে সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কৃষি এবং এর বিভিন্ন উপখাতসমুহকে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার বাইরে রেখেছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সরকারের রাজস্ব আদায় কার্যক্রম কেবল মাত্র শিল্প এবং সেবা খাতের উপরণ বেশীরভাগ নির্ভরশীল। তবে সরকারের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু শিল্পোদ্যাক্তা কৃষি উপখাত বিশেষ করে মৎস্য, ডেইরি এন্ড পোল্ট্রি, খাদ্য ও ফল-মুল প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে এবং মুনাফাও অর্জন করছে। এসকল বিনিয়োগে কিছু কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও এর মুল উদ্দেশ্য কিন্তু কর দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

৩. আমাদের বর্তমান রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার রাজস্ব নীতির (অর্থাৎ রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় পরিকল্পনা) সমন্বয় করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে একদিকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে চাহিদা অনুসারে সরকারের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, অন্যদিকে বিনিয়োগের জন্য রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের সীমাবদ্ধতা। এসকল সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে মুলত আমাদের অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা, রাজস্ব আদায়ে সরকারের সাংগঠনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে। আমাদের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার কাঠামোগত এবং নীতিগত কিছু দুর্বলতার বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো

ক. স্বল্প জনবল সম্পন্ন দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৯০ সালে প্রথমবারের মতো রাজস্ব বিভাগের সংস্কার করা হয় এবং এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের মাধ্যমে জেলায় জেলায় কর সার্কেলসহ বেশ কিছু জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা চালু করা জন্য সংস্থাকে উপযোগী করে গড়ে তোলা। কিন্তু এর পর অনেক সময় পার হলেও সময়ের পরিবর্তন ও রাজস্ব আদায়ের গতিশীল প্রবণতার সঙ্গে সমন্বয় করে এর কোন পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়নি। অথচ ১৯৯১ সালে ৬,১৫২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় দিয়ে ভ্যাট কার্যক্রম শুরু করার পর ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৯৬,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছালেও রাজস্ব বিভাগের জনবল এবং অবকাঠামোগত কোন প্রকার সম্প্রসারণ করা হয়নি। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর কমিশন ও সার্কেল অফিসগুলোতে কোথাও ২ জন আবার কোথাও সর্বোচ্চ চার জন কর পরিদর্শক রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। রাজস্ব বোর্ডের তথ্যমতে গত দুই দশকে সামগ্রিক কর ব্যবস্থাপনায় মূসক প্রদানকারী শিল্প ও ব্যবসায়ির পরিমাণ ৩২০০%, আমদানি কার্যক্রম ৪৭১%, রপ্তানি কার্যক্রম ২০৫৪%, বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৭৫% এবং আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬২০ শতাংশ (সূত্র প্রথম আলো ১৫.০৫.১১)।

খ. রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নেও রাজস্ব বোর্ডের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে

অন্যান্য দেশের রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এবং কার্যপরিধি বিশেস্নষণ করে দেখা যায়, বাস্তবে বাংলাদেশের রাজস্ব বোর্ডের ক্ষমতা অনেক সীমিত। এনবিআরের চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী নিয়োগ, কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ প্রতিরোধে সংস্থার নিজস্ব বিধি-বিধান তৈরির কোনো ক্ষমতা নেই। এনবিআর কখনোও এর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, বা বাজেট তৈরিতে বিভিন্ন কর হার বা অন্যান্য শর্তসমূহ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। অথচ বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজস্ব আদায় পরিকল্পনায় অনুসৃত কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজস্ব বিভাগের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। যেমন সিঙ্গাপুর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কর্তৃপক্ষ (ওজঅঝ) রাজস্ব সংগ্রহের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ঈধহধফরধহ জবাবহঁব অমবহপু (ঈজঅ) সরকার এবং বিভিন্ন প্রদেশের জন্য কর আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রদেশ এবং সরকারি যে কোনো সংস্থার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য কর হার এবং সেবাসমুহের ব্যয়-পুনরুদ্ধারের ভিত্তিতে নতুন পার্টনারশিপে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এর আছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যুরোর নিজস্ব আইন এবং বিধান তৈরির ক্ষমতা রয়েছে।

গ. বাজেট তৈরিতে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা

evsjv‡`‡ki wRwWc I Ki-ivR¯^ AbycvZ wPÎ

A_eQi	Ki-ivR¯^ AbycvZ
2005-06	8.55
2006-07	8.27
2007-08	9.06
2008-09	8.89
2009-10	9.34
2010-11	10.49
2011-12	10.52
2012-13 c¯ÍweZ	11.21

mÎt GbweAvi evwlK cwZ‡e`b 2011

সরকার ইতোমধ্যে ‘সরকারি অর্থায়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯’ পাস করার মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংক্রান্ত দায়িত্ব সুস্পষ্ট করেছে। যদিও এনবিআর গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে বাজেট বিষয়ে পরামর্শ শুরু করেছে, তবে বাজেটের বিভিন্ন নীতি প্রণয়নে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অবৈধ প্রভাব বিস্তারের কারণে তা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। এনবিআর বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দিলেও অনেক ক্ষেত্রে এর অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের পরিমাণ নিজে নিশ্চিত করতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অর্থমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এটা বলা যায় যে, রাজস্ব আদায় কার্যক্রম কোন অবস্থাতেই গতিশীল হবে না যদি সময় ও প্রয়োজেনর সঙ্গে সংগতি না রেখে প্রশাসনিক অবকাঠামো, দক্ষ জনবল এবং আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা নিশ্চিত করা না হয়। কারণ দুর্বল অবকাঠামো, দক্ষ জনবল এবং আধুনিক প্রযুক্তি স্বল্পতার কারণে বেশির ভাগ সময়ই করের ক্ষেত্রসমূহ প্রয়োজনীয় ও কার্যকরভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। যার ফলে রাজস্ব আদায়ের অনেক ক্ষেত্র এখনোও অচিহ্নিত, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে আমাদের অর্থনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় আরও কিছু প্রলম্বিত ঋণাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন:

ঘ. নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত

একটি দেশের উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে হলে কর রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং এটি টেকসই উন্নয়নে একটি দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক কৌশল। তাছাড়া দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তা নির্ভর করে ঐ দেশের জিডিপি'র আনুপাতিক তুলনায় কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হচ্ছে তার উপর। কিন্তু বিষয়টি দুখঃজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের জিডিপি'র তুলনায় কর-রাজস্ব আদায়ের হার অনেক কম। যদিও বর্তমান সরকার রাজস্ব আদায়ে বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আদায়ের হারে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার পরেও এখনও তা সন্তোষজনক নয়। কারণ রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা বিশেস্নষণ করলে দেখা যায় যে, প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে মুলত পরোক্ষ কর থেকে কিন্তু প্রত্যক্ষ করের প্রবৃদ্ধি তেমন হচ্ছে না। বর্তমান সরকার তার ভিশন-২০২১ প্রণয়ন করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আগামী দিনগুলোতে দেশে ব্যাপক বিনিয়োগ করা হবে এবং এর মাধ্যমে ২০১৩ সালের মধ্যে জিডিপি'র ৮% প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের রয়েছে। কিন্তু এটা করতে হলে দেশে জিডিপি'র ৩০-৩২% বিনিয়োগ করতে হবে, যা অনেকটাই সম্ভব হতে পারে যদি কর-রাজস্ব ও জিডিপি অনুপাত আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সরকারের বর্তমান রাজস্ব অবকাঠামো দিয়ে কোন অবস্থাতেই এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের কর-রাজস্ব ও জিডিপি অনুপাত পৃথিবীর অনেক দেশ এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্ন। যেমন কর-রাজস্ব ও জিডিপি অনুপাত ভারতে ১৭.৭%, শ্রীলঙ্কায় ১৫.৫%, পাকিস্তানে ১৪.৬%, মালদ্বীপে ২০.২% অথচ বাংলাদেশে মাত্র ১০%। অন্যদিকে শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোতে কর-জিডিপি অনুপাত ৪০-৫৫% পর্যন্ত দেখা যায়।

বাংলাদেশে নিম্ন কর-জিডিপি'র অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে কর ফাঁকি এবং মুসক আত্মসাৎ, কর-জিডিপি বৃদ্ধি করতে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য না থাকা, কর আত্মসাৎ/ফাঁকির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান না থাকা অথবা শাস্তি না হওয়া, অপ্রতিরোধ্য/বিনা বাধায় কালো টাকা উপার্জনের সুযোগ, কর আদায়কারী এবং সম্ভাব্য কর প্রদানকরারীর মধ্যে অবৈধ সংযোগ, অটোমেশন না থাকা, কর প্রদানে জটিলতা ও হয়রানির ভয়, কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার, জটিল কর আইন এবং দুর্নীতির সুযোগ, প্রত্যক্ষ কর ও কৃষি খাত হতে কম কর আদায়, নাগরিকের উপর উচ্চ কর-ভার, উৎস করের আওতায় কম সংখ্যক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা, কর সংগ্রহকারীদের অপ্রতুল সুযোগ সুবিধা, কর না দেওয়ার সংস্কৃতি, সুশাসনে দুর্বলতা এবং কর আদায়ে পর্যাপ্ত জনবল না থাকা (সূত্র: টিআইবি)।

ঙ. প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি অনেক দুর্বল

বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বল দিক হলো কর আদায়ে পরোক্ষ তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অবদান খুবই কম। আমাদের কর আদায়ের সাফল্য নির্ভর করে পরোক্ষ কর বিশেষ করে ভ্যাট এবং আমদানি শুল্কের মতো পরোক্ষ কর আদায়ের উপর। পরোক্ষ করের উৎস গুলি হচ্ছে আমদানি শুল্ক, ভ্যাট, আবগারী শুল্ক সম্পূরক শুল্ক, টার্ন-ওভার ট্যাক্স ইত্যাদি। এ সকল শুল্কসমূহ আরোপের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের প্রায় ৭০% আসে। অপরদিকে প্রত্যক্ষ করের উৎস হচ্ছে আয়কর (এর মধ্যে কর্মচারীর বেতন-ভাতা, ব্যক্তিগত আয়, কোম্পানির মুনাফা ইত্যাদি), ভ্রমণ কর এবং এসকল উৎস থেকে রাজস্ব আয়ের ২০-২৫% আসে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান ছিল ১৮% এবং বিগত দুই দশকের ব্যবধানের অর্থনীতিতে শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের আকার ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের যে প্রাক্কলন করা করা হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৫,৩০০ কোটি টাকা যা মোট রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৫.২৭%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সার্বিক রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেখানে প্রত্যক্ষ করের অবদান সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশের মতো আরও উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজস্ব আদায়

ivR¯^ Av`v‡q LvZIqvix Ae`vb

A_eQi	AvbcvwZK nvi %	
	cZ¶¨ Ki	c‡iv¶ Ki
1991-92	18%	82%
1994-95	14%	86%
2000-2001	19.4%	80.56%
2004-2005	19.49%	80.51%
2008-2009	27.17 %	72.83%
2009-2010	28.09%	71.9%
2010-2011	29.49%	70.51%
2011-2012	24.42%	75.58%

Z¨ mÎt GbweAvi evwlK cwZ‡e`b 2011

কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অবদান বেশি।

রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য (এনবিআর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১) অনুসারে বাংলাদেশে কর প্রদানকারীর (টিআইএনধারী) সংখ্যা ২০৭৫২৬০ জন। এর মধ্যে কোম্পানি করদাতা ৬১,৯৯৮ জন, বাকিরা ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সকল করদাতার সবাই কি কর দেয়? এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ডের প্রদত্ত বিশেস্নষণ থেকে দেখা গেছে যে, ৮, ৪০২১৭ জন (৪০.৯%) করদাতার শুধুমাত্র ফাইল আছে, অর্থাৎ এরা কোন নিয়মিত করদাতা নয়। আবার নূন্যতম করদাতার সংখ্যা হচ্ছে ৩৯০৯৬৪ জন, যা মোট করদাতার ১৮.৮৩%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাত্র ৮৪০৭৪৮ জন (৪০.৫%) লোক নিয়মিত কর প্রদান করছে, অর্থাৎ বিদ্যমান টিআইএনধারীদের অর্ধেকেরও কম লোক কর প্রদান করছে। এর প্রধান কারণসমূহ হলো রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকৃত করদাতাদের চিহ্নিত করার দুর্বলতা, ভুয়া টিআইএনধারির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি, কর প্রদানকারীদের কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সুবিধা না পাওয়া, প্রদত্ত কর সঠিকভাবে ব্যবহারে সরকারের উপর আস্থার ঘাটতি, জটিল কর আইন ও সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহকারীর সঙ্গে কর ফাঁকিতে নিয়োজিতদের যোগসাজশ, কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ বা রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতিবাজদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করা, অটোমেশন এবং ই-গভর্নেন্সের অভাব, কর প্রদানে নাগরিকদের সচেতনতা ও প্রণোদনার ঘাটতি এবং সুশাসনের অভাব এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা অন্যতম।

চ. অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ "রাজস্ব আয়ের পথে বড় বাধা"

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি দুর্বল হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বা টহফবৎ এৎড়ঁহফ উপড়হড়সু। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আয়তন কী পরিমাণ তা নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন প্রকার গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবে এর উপর বহিঃ উৎস থেকে কিছু গবেষণা করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ৩৭% পরিচালিত হচ্ছে টহফবৎ এৎড়ঁহফ উপড়হড়সু বা অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে (কবির হোসেন, অধ্যাপক নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়)। ফলে এর সাথে জড়িত সকল আয় এবং মুনাফা কোন ক্রমেই কর ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণার তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কর ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ২১০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হতো, যা ঐ বছরের সংগৃহীত রাজস্বের ৩৪% এবং মোট জিডিপি'র প্রায় ৩%। সেটা না করে সরকার প্রতি বছর বাজেটের পুর্বে অথবা বাজেটের পরবর্তী সময়ে কর আদায়ের নামে এ সকল অনৈতিক ব্যবসায়ীদেরকে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে, যেটা আসলে কর আদায় ব্যবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছে না। বরং এটা রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মকে উৎসাহিত করার প্রয়াস সৃষ্টি হচ্ছে, যা অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আরও বিস্তার ঘটাতে সহায়ক হবে। কালো টাকার মালিকদের ক্রমাগত এ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এক অর্থে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকার শিল্প বা ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির নামে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার কথা বললেও বাস্তবে তা কতটুকু কার্যকর তা আরো গবেষণা ও বিশেস্নষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

৪. কর ব্যস্থাপনায় দুর্নীতি নিম্ন রাজস্ব আদায়ের আরও একটি কারণ

বাংলাদেশের জটিল কর ও শুল্ক আইন কর সংগ্রহকারী এবং কর প্রদানকারী উভয়কেই অনৈতিক সুবিধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। যে কারণে রাজস্ব আদায়ে কার্যকর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয় না। কর এসেসমেন্ট, আমদানি-রপ্তানি শুল্কায়নে জটিলতা ইত্যাদির কারণে একদিকে রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্মকর্তাগণ তাদের ক্ষমতা অপব্যবহার করার সুযোগ পায়, অন্যদিকে কর প্রদানকরীরাও এসকল জটিলতা এড়াতে অনৈতিক সুবিধা প্রদান করে এবং কর ফাঁকি দেওয়ার পথ খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি, কোম্পানি, আমদানি-রপ্তানি শুল্কায়ন, বিভিন্ন অডিট ফার্মের যোগসাজশে কিভাবে কর ফাঁকি দেওয়া হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো;

ক. ব্যক্তি আয়ের ক্ষেত্রে কর ফাঁকির উপায়সমূহ

- প্রকৃত আয় গোপন, সরকারি কর্মকর্তাদের অবৈধ আয় গোপন ও বিদেশে বিশেষ করে কর-স্বর্গ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশে জমা, সম্পদ ক্রয় এবং বিনিয়োগ করা
- বেসরকারি চাকরিজীবীদের বেতনের একাংশ কর-অবকাশ সুবিধাভুক্ত আয়-ব্যয় (যেমন, চিকিৎসা/ভ্রমণ ভাতা, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি) হিসেবে প্রদর্শন
- পরিবারের সদস্য, যারা আয়করভুক্ত নন, নিকটাত্মীয় এবং বন্ধুদের নামে পস্নট, ফ্ল্যাট, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ব্যবসার শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয়
- ব্যবসার-লভ্যাংশ কর অব্যহতি প্রাপ্ত ব্যবসায় বিনিয়োগ, প্রকৃতপক্ষে ভুয়া হিসেবে প্রদর্শন, আয়কর রিটার্ন ফরমে ব্যক্তিগত সব ব্যাংকের হিসেবের অনুলেস্নখ রাখা
- উপার্জিত কালো/অবৈধ অর্থ কর-অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষ্যে বিদেশে পাচার এবং বিনিয়োগ করা

খ. কর্পোরেট বা ব্যবসা ক্ষেত্রে

- হিসেবের খাতায় দ্রব্য বা সেবার অতিরিক্ত উৎপাদন/পরিচালন ব্যয়, ভুয়া ভাউচার বা উচ্চ বিক্রয়মূল্য প্রদর্শন এবং টাকা প্রদানের রেকর্ড উপস্থাপন
- কম পরিমাণে কর প্রদানের জন্য পৃথক লেজার হিসাব বই, অর্থ প্রাপ্তি রশিদ এবং খরচের খাতা ব্যবহার করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় কম লাভ বা লোকসান প্রদর্শনপূর্বক কর ফাঁকি দেয়া
- ব্যবসা/কোম্পানির করযোগ্য লাভ বা আয়কে কর-অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত খাতে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ বা ভুয়া উন্নয়ন খরচ দেখিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা
- কর অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষ্যে প্রকৃতপক্ষে না হলেও ২০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা করা
- কাস্টমস বন্ডের আওতায় দ্রব্য আমদানি করে রফতানি দ্রব্যে ব্যবহার না করে গোপনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দেয়া
- করযোগ্য আয়কে গোপন করার জন্য ব্যবসা বা কোম্পানির নামে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ

- অতিরিক্ত মূল্যে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানির নামে অবৈধ অর্থ পাচার
- কোন ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয় দেখানো (রিয়েল এস্টেট/ডেভেলপার ফার্ম ইত্যাদি)
- রশিদ ব্যতীত ক্রয়-ব্যয়, ক্রেতার নিকট হতে কোম্পানি কর্তৃক অর্থ গ্রহণ
- মূসক এবং আয়কর ফাঁকি দেয়ার জন্য উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ স্বল্প করে দেখানো
- মূসক এবং আয়কর ফাঁকি দেয়ার জন্য উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিক্রয়কৃত দ্রব্যের একটা অংশ অযোগ্য হিসেবে দেখানো
- উৎপাদন/উপকরণ/যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক কাঁচামালের (যেমন, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে) দাম বেশি করে দেখানো ।

৫. কর অবকাশ সুবিধা "কর ফাঁকি দেওয়ার একটি হাতিয়ার"

স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার বিভিন্ন শিল্পোদ্যাক্তাদেরকে বিভিন্ন কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, দরিদ্র বান্ধব শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর অবকাশ সুবিধার ভাল ভূমিকা রাখতে পারে এবং এতে শিল্পায়ন এবং করের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এসকল কর অবকাশ সুবিধার একটা মূল্য রয়েছে, যেটা সরকারকে বহন করতে হয় বিশেষ করে প্রতি বৎসর কয়েক হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারানোর ক্ষতিকে স্বীকার করে। আবার এটাও দেখা যাচ্ছে যে, কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার করে শিল্পপতিগণ কর না দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যার ফলে কর অবকাশ মেয়াদ পার হবার পরও সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজস্ব বোর্ডের এক প্রতিবেদন (এনবিআর, মার্চ ২, ২০১১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর গড়ে জিডিপি'র ২.৫২% রাজস্ব ক্ষতির শিকার হচ্ছে শুধুমাত্র কর অবকাশ দেওয়ার কারণে। তার পরেও বর্তমান সরকার আগামী কর অবকাশ সুবিধা ২০১৩ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সর্বমোট ১৮টি খাতে এই কর অবকাশ সুবিধা দেওয়া হবে যার মধ্যে বস্ত্র, পাট, ঔষধ শিল্প এবং ম্যালামাইন ইত্যাদি উলেস্নখযোগ্য। ফলে সরকার ২০১৩ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে ১৮০০০ কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এনবিআর এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে কর অবকাশ সুবিধার কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৪৯৫.৬৩ কোটি টাকা।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কর অবকাশ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কি সরকার এসকল শিল্পখাত থেকে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হবে? বাংলাদেশ সরকারের গঠিত রাজস্ব সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট (২০০৩) মতে, ঁীবসঢ়ঃরড়হং ধহফ ঃধ যড়ষরফধুং যধাব পৎবধঃবফ ধ ফরংঃড়ৎঃবফ ঢ়ৎড়ফঁপঃরড়হ ংঃৎঁপঃঁৎব ষবধফরহম ঃড় ষধৎমব ৎবাবহঁব ষড়ংংবংচ। অভিজ্ঞতা বলে যে, কর অবকাশকাল শেষ হওয়ার পর একই কোম্পানি লোকসান দেখাতে শুরু করে অথবা কর হ্রাস সুবিধা পাওয়ার জন্য উপার্জিত লাভ অন্য নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে (দুদক অনুসন্ধান রিপোর্ট, ২০০৮)। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে কর অবকাশ সুবিধার প্রকৃত প্রভাব নির্ণয়ে এখন পর্যন্ত কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়নি। এছাড়া আরও উলেস্নখ্য যে, কর ফাঁকিতে সার্বিকভাবে বিভিন্নভাবে সিএ ফার্মের সহায়তার অভিযোগও রয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি কর অবকাশ সুবিধার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশেস্নষণের মাধ্যমেই এ ধরনের সুবিধা প্রদানের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেয়া উচিৎ। কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে কর প্রণোদনা বা কর অবকাশ সুবিধার প্রভাব যাচাই না করে আইনের পরিবর্তন করা হচ্ছে, যেমন এসআরও জারি করে ২০০৯ সালে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত কর অবকাশ সুবিধা ২০১১ সনের ৩১শে জুন পর্যন্ত বৃদ্ধির ফলে কর ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে ভ্যাট কার্যক্রমের অবতারণা ও সম্প্রসারণ

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) চালু করা হয় ১৯৯১ সালে। এর পূর্বে কর বা রাজস্ব আদায় করা হতো বিক্রয় কর এবং আমদানি শুল্কায়নের মাধ্যমে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি গ্রহণ করে এর আওতায় কর ব্যবস্থা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ভ্যাট চালুর উদ্দেশ্যে নতুন ভ্যাট আইন প্রনয়ন করে, যা ১৯৯১ সালে সংসদ কর্তৃক পাশ করা হয়। বাংলাদেশে ভ্যাট কার্যক্রম চালুর মুল উদ্দেশ্য ছিল কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের বিভিন্ন স্তরে কর ফাঁকি দেওয়ার যে সুযোগ ছিল সেগুলো বন্ধ করা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ মবিলাইজেশনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করা এবং সর্বপোরি কর-জিডিপি'র অনুপাত বৃদ্ধি করা।

শুরুতে ভ্যাট বা মূসক আরোপ করা হয়েছিল মুলত অল্প কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আমদানি পণ্য এবং যে সকল ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক লেনদেন বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি। ভ্যাট কার্যক্রমের শুরুতে ১৯৯১ সালে পরীক্ষামুলকভাবে মাত্র ২১টি পণ্যের উপর ভ্যাট বা মূসক আরোপ করা হলেও বর্তমানে প্রায় সব পণ্যের উপরণ ভ্যাট বিদ্যমান। কারণ ভ্যাটের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং ভোগ্য-কর আইনের (ঈড়হংসঢ়ঃরড়হ ঞধী) আওতায় যে কোন পণ্য বা সেবার আমদানি এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাইকারী এবং খুচরা বিক্রয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ফলে এরকম কোন পণ্য নাই যেটা বাস্তবে ভ্যাট আওতার বাইরে রয়েছে।

৭. নতুন ভ্যাট আইন ২০১২, বাড়বে করের পরিধি

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) চাপে বাংলাদেশ সরকার তার বর্তমান ভ্যাট আইন পর্যালোচনা করতে যাচ্ছে। নতুন করে ভ্যাট আইন-২০১২ এর খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং জাতীয় সংসদে পাশ করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে আগামী ২০১৫ সাল থেকে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করা হবে, যাতে করে ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ীগণ নতুন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা সমন্বয় করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডর সূত্রে জানা যায় যে, নতুন ভ্যাটের প্রস্তাবিত খসড়ায় এ পর্যন্ত ৮০টি পরিবর্তন আনা হয়েছে (সূত্রঃ ঋরহধহপরধষ ঊীঢ়ংবংং ২৯.০১.২০১২) যার মুল লক্ষ্যই হচ্ছে ভ্যাটের আওতা বাড়ানো এবং রাজস্ব আদায়ের বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। নতুন ভ্যাট আইনে বর্তমানে

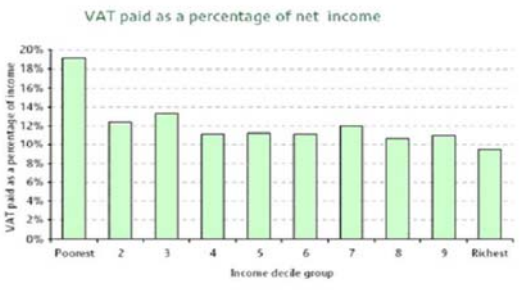

প্যাকেজ ভ্যাট, সংকুচিত ভিত্তিমূলের উপর মূসক হিসাবের প্রচলিত পদ্ধতি বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে উৎপাদনের প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ১৫% মূসক হিসাব করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে কোন পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাটের পরিমাণ বর্তমানের চাইতে বেশি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন প্রস্তাবিত ভ্যাট আইনে ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আরোপিত ভ্যাটের হার বৃদ্ধি পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন ও ব্যবসায়ীক কার্যক্রম, সম্পদ স্থানান্তর ও হস্তান্তর এমনকি সকল মৌলিক ভোগ্যপণ্যের উপরও ভ্যাটের আওতায় আনা ও ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ২% থেকে শুরু করে ১৫% পর্যন্ত ভ্যাট প্রচলন রয়েছে। উৎপাদন, বিক্রি, আমদানি, পাইকারি এবং খুচরা পর্যায়ে এই ভ্যাট হার বিদ্যমান রয়েছে যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন সিঙ্গাপুরে এই হার সর্বোচ্চ ৫শতাংশ, থাইল্যান্ডে ৭%, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, লেবানন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১০%, নিউজিল্যান্ডে ১২% এবং নেপালে ১৩% পর্যন্ত বিভিন্ন হারে ভ্যাট আরোপ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যসমূহ করমুক্ত রাখা হলেও বাংলাদেশে এই চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশের সরকার দরিদ্র মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের উপর ভ্যাট আরোপ করেছে।

২০১২-১৩ এর অর্থবছরের নতুন বাজেটে মূসকের আগ্রাসন প্রায় অপ্রতিরোধ্যই বলা যায়। যদিও মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন মূসক আইনের বাস্তবায়ন শুরু হবে আগামী ২০১৫ সাল থেকে। কিন্তু বাস্তবতা বলে দিচ্ছে অর্থমন্ত্রী সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান না। তিনি নতুন অর্থবছরে আমদানি, উৎপাদন, খাদ্য-দ্রব্য, নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার সকল পর্যায়ে মূসক পরিধি বিস্তারসহ মূসক হার বৃদ্ধির প্রস্তাব করেণ, বিশেষ করে মূসক পরিধি বিস্তারের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে, পাড়া ও মহলস্নায় পরিচালিত সকল উৎপাদন ও ব্যবসাকে মূসকের আওতায় আনা এবং এর উপর বর্ধিত হারে (সমান্তরাল হারে ৪%, যা পূর্বে ব্যবসা ভেদে থেকে ১৮০০ টাকা এবং কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে ২% পর্যন্ত ছিল) মূসক আরোপের প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকা- বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তরা ও তাদের উৎপাদন কার্যক্রমও মূসকের আওতায় আসবে, ফলে তাদেরকে অতিরিক্ত কর প্রদানের কারণে উৎপাদন খরচ বাড়বে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

৮. মূল্য ব্যবস্থার উপর ভ্যাটের প্রভাব কী রকম

ভ্যাট আরোপের ফলে পণ্যের মূল্যের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বা পণ্য মূল্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে কি না তা নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা করা হয়নি। তবে আন্ত র্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ১৯৮৫ সালে বিশ্বের বেশ কিছু দেশের উপর বিশেষ করে যে সকল দেশ ভ্যাট চালু করেছে এরকম ২৯টি দেশের উপর এক গবেষণা পরিচালনা করেছে। তাদের প্রদত্ত প্রতিবেদন অনুসারে দেখা গেছে যে, ভ্যাট চালুর পর মাত্র ২৭টি দেশে কোন মূল্য বৃদ্ধি পায়নি এবং মাত্র দুটি দেশে তাদের পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি শুধুমাত্র ভ্যাটের আরোপের ফলে সৃষ্ট মূল্য ব্যবস্থার আনুপাতিক পরিবর্তনের উপরণ শুধু নির্ভর করে না বরং ঐ দেশের প্রচলিত বাজার ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, সু-শাসন এবং পণ্যের চাহিদা-সরবরাহ ব্যবস্থার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশগুলোর বাজার ব্যবস্থা এতটাই ভঙ্গুর যে, পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থা একটু বিঘ্নিত হলেই সরকারের পক্ষে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং একথা খুব চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা সম্ভব হবে না যে ভ্যাট আরোপের ফলে আমাদের দেশে মূল্য ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হবে না।

ভ্যাটের আওতায় উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে চক্রবৃদ্ধি হারে ভ্যাট আরোপের ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং উক্ত মূল্য বৃদ্ধির চূড়ান্ত ভার গিয়ে পরবে প্রকৃতপক্ষে ভোক্তার উপর। অন্যদিকে ভ্যাট আইনে কর রেয়াতের যে বিধিমালা রয়েছে তার কোন সুফল ভোক্তারা পাবে না। কারণ ভ্যাট আইনে বলা হয়েছে কর রেয়াত পেতে হলে কর প্রদানকারীকে নিবন্ধিত হতে হবে। যেহেতু ভোক্তাগণ কোন প্রকার নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নন, সুতরাং সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর-ভার তারা বহন করলেও কর রেয়াত সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত।

ভ্যাট সম্পর্কিত প্রভাব মূল্যায়নের উপর ওঋঝ (ওহংঃরঃঁঃব ড়ভ ঋরংপধষ ঝঃফুঁ-টক) এর এক প্রদিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, পরোক্ষ কর সব সময়ই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দমনমূলক (জবমৎবংংরাব), কারণ এই ধরনের কর উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে অব্যাহতভাবে আঘাত করে এবং তাদের উন্নয়নের পথকে অনেকাংশেই রুদ্ধ করে দেয়। কারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আয়ের অধিকাংশ অংশই খরচ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের পেছনে ফলে ধনীদের তুলনায় আনুপাতিক হারে দরিদ্রদের উপর কর ভারও বেশি পরে। তারা গবেষণা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে, যুক্তরাজ্যে ভ্যাট আরোপের ফলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভ্যাট প্রদানের হার প্রায় দ্বিগুন।

৯. দরিদ্র বান্ধব কর ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সুপারিশ

ক. রাজস্ব বিভাগের সংস্কার ও দুর্নীতি বন্ধ করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসুচি হওয়া উচিৎ

এটা সত্য যে, বাজস্ব বিভাগের দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামো, স্বল্প ও অদক্ষ জনবলের কারণে রাজস্ব আদায়ের গতি মন্থর। তবে এটাও সত্য যে দুর্নীতির কারণে বর্তমান সক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ রাজস্ব পাওয়ার কথা সেটা থেকেও সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং রাজস্ব বিভাগের সংস্কারের বিষয়টি শুধুমাত্র অবাকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল তৈরির সাথেই সম্পৃক্ত থাকতে পারে না। এর সাথে অবশ্যই রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে সকল দুর্নীতি হয়ে থাকে সেগুলো রোধ করার জন্যও সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজস্ব বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে ঞওই'র এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে "গত ৩৫ বছরে রাজস্ব বিভাগের কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যে পরিমাণ অবৈধ টাকা আয় করেছে তার পরিমাণ এক বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় সমান''। সৃতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় রাজস্ব বিভাগে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়ে থাকে। আমরা মনে

করি, দুর্নীতি বন্ধ হলে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ অবশ্যই বর্তমানের তুলনায় ২০-২৫% বৃদ্ধি পেতে পারে।

রজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে অবকাঠামো উন্নয়ন বর্তমানে খুবই জরুরি বিষয় এবং সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। নতুন সংস্কার প্রস্তাবনায় রাজস্ব বিভাগের জনবল দ্বিগুণ সংখ্যায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, ভ্যাট অবকাঠামো উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করার পকিল্পনা করা হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নের কাজ নতুন অর্থবছর থেকেই শুরু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু সংস্কার পরিকল্পনায় কিছু বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা হয়নি, যেমন- কর আইন সংস্কার করা, করা প্রদানের জটিল পদ্ধতিকে সরলীকরণ করা। কারণ এসকল জটিল আইনের কারণেই করদাতারা বেশি হয়রানির শিকার হন।

খ. প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দেশে ২২,৩১২ কোটিপতির মধ্যে ১০০,০০০ টাকার উপরে কর দেয় এমন করদাতার সংখ্যা মাত্র ১,০০০। এই চিত্র থেকেই বোঝা যায় প্রত্যক্ষ কর কিভাবে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এবং এর পরিমাণ কত বিশাল। সুতরাং রাজস্ব আদায়ে গতি সঞ্চার করতে হলে কর ফাঁকি দেওয়ার এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান খুবই কম (মাত্র ২৫%), অথচ অন্যান্য উন্নয়শীল দেশে এই হার বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশি। যেমন ভারতে ৩৩%, শ্রীলঙ্কায় ৩১.৩% এবং উন্নত ধনী দেশগুলোতে ৭০% এরও উপরে। সুতরাং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হলে প্রত্যক্ষ করের আওতা অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং সকল টিআইএন ধারীকে করের আওতায় আনতে হবে। আবার দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ৩৭% পরিচালিত হচ্ছে টহফবৎ এৎড়ঁহফ উপড়হড়সু বা অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। সরকারকে এসকল কার্যাবলিকে কর ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে, তাহলে রাজস্ব আদায় কার্যকরভারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

উন্নত দেশগুলোতে যেখানে জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রত্যক্ষ কর তথা আয়করের পরিমাণ বাড়িয়ে রাজস্ব আয়ের সংকুলান করা হচ্ছে সেখানে আমাদের দেশের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যায়। আমাদের বর্তমান জিডিপি'র যে আয়তন তা হিসাবে আনলে সরকারের হিসাব অনুসারে ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব আদায়ের ৪০-৫০% লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যক্ষ কর থেকেই পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী তা করতে ব্যর্থ হয়ে রাজস্ব আদায়ের সহজ কৌশল হিসেবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর পরোক্ষ কর তথা ভ্যাট চাপিয়ে দিচ্ছেন যা কোন ক্রমেই কর-ন্যায় বিচারের (কারণ তিনি তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন রাজস্ব আদায়ের মূলনীতি হবে আয়- বৈষম্য দুর করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, যা কর ন্যয় বিচারের প্রধান ভিত্তি) পর্যায়ে পরে না।

গ. সরকার আলাদা কর অনুসন্ধান ইউনিট গঠন করতে পারে

আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থায় কর ক্ষেত্র অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ, কর আদায় যোগ্যতা নিরুপণ এবং কর আদায়ের কাজটি বাস্তবায়ন করে মুলত একই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ফলে এর মধ্যে কর আদায়ে এক ধরনের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয় এবং পাশাপাশি ব্যাপক দুর্নীতির ক্ষেত্রও তৈরি হয়, যার ফলে রাজস্ব আদায়ের গতি মন্থর হয় এমনকি রাজস্ব আদায়ের হারও কমে যায়। সুতরাং কর ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে হলে এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে কর ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং কর আদায় কার্যাবলিকে আলাদা ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে কর ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য আলাদা কর অনুসন্ধান ইউনিট গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে যারা কর ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে তারা কোন অবস্থাতেই কর আদায়ের সাথে জড়িত হতে পারবে না। এতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির পরিমাণ হ্রাস পাবে বলে আমরা মনে করি।

ঘ. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর ভ্যাট সম্প্রসারণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে

সরকার আইএমএফ'র পরামর্শে ভ্যাট আইন সংস্কার করছে, যার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল পণ্যকে ভ্যাটের আওতায় আনা এবং খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট সম্প্রসারণ ও ভ্যাট হার বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশসমুহের জনগোষ্ঠীদের তাদের আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয় জীবন যাত্রার খরচ মেটানোর জন্য, পক্ষান্তরে এ সকল দেশের ধনীক গোষ্ঠী আয়ের প্রধার উৎস হচ্ছে ঘুষ-দুর্নীতি, অনৈতিক এবং করবহির্ভূত অর্জিত মুনাফা এবং এসকল অর্থের বেশির ভাগই ব্যয় হয় বিলাসি জীবন-যাপনে যেটা অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ঘটাতে সহায়তা করে। যে কারণে মূল্যস্ফীতি এবং ভ্যাট তথা পারোক্ষ করের দ্বি-মুখী চাপ সাধারণত দরিদ্র মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং আমারা মনে করি দরিদ্র মানুষকে এসকল নেতিবাচক অর্থনৈতিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সরকারকেই ভূমিকা রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবাসমুহের উপর প্রস্তাবিত বর্ধিত মুসক হার সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হবে। ভ্যাট আরোপের বিষয়টি সরকারকে অর্থনৈতিক এবং কর ন্যায্যতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ধনীদের ভোগ্য পণ্যের উপর ক্রমবর্ধমান হারে ভ্যাট আরোপ করতে হবে এবং দরিদ্র মানুষের ভোগ্য পণ্যের উপর কোন প্রকার ভ্যাট আরোপ করা উচিৎ হবে না।

ঙ. কর ন্যায়পাল কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে হবে

আমাদের বর্তমান অর্থমন্ত্রী কর ন্যায়পাল পদ বাতিলের উদ্দেশ্যে 'কর ন্যায়পাল আইন (রহিতকরণ) বিল ২০১১' সংসদে উত্থাপন করে এর কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন। কিন্তু, বিদ্যমান আইনের যথাযথ সংস্কার ব্যতিরেকেই প্রথম কর- ন্যায়পালের পদ বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্তটি সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। কারণ কর-ন্যায়পাল কার্যকর না থাকলে তা একদিকে রাষ্ট্র যেমন তার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে অন্যদিকে করাদাতারাও রাজস্ব বিভাগের একচ্ছত্র আধিপত্য ও হয়রানির কারণে কর-ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উলেস্নখ্য যে, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও যখন বিভিন্ন খাতভিত্তিক ন্যায়পাল নিয়োগের দাবি জোরদার হচ্ছে, তখন কর-ন্যায়পাল কার্যক্রম স্থগিত করা কোন অবস্থাতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কর-ন্যায়পাল কার্যালয় "একটি ব্যয়সাধ্য ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হইয়াছে" মর্মে সংসদে প্রদত্ত বিবৃতি করা সরকারের জন্য "স্ববিরোধী"। কারণ এই যুক্তি সরকারের অন্যান্য প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে সেক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠানও কি বিলুপ্ত করা হবে? উলেস্নখ্য, প্রয়োজনীয় জনবল এবং সম্পদ না

থাকা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬-২০০৯ পর্যন্ত কর প্রদানকারী কর্তৃক নিবন্ধিত ৩৩৪টি অভিযোগের মধ্যে ৩০৪টি অভিযোগের সমাধান করেছে। একতরফাভাবে কর-ন্যায়পাল পদের বিলুপ্তির প্রশাসনিক উদ্যোগ করব ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুর্নীতি ও অনিয়মকে উৎসাহিত করবে। সুতরাং কর-ন্যায়বিচরের স্বার্থে কর ন্যায়পাল নিয়োগের সিদ্ধান্তটি সরকারের উচিৎ পুনঃবিবেচনা করা।

চ. সরকারকে অনুন্নয়ন ব্যয় কমাতে হবে এবং সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে

বিষয়টি সরাসরি রাজস্ব আদায়ের গতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত না হলেও রাজস্ব ব্যবহারের গুণগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ এটা সত্য যে সরকারি ব্যয়ের হ্রাস করা সম্ভব হলে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রতি বছর আমাদের রাজস্ব আয়ের একটা বড় অংশ খরচ হয়ে যাচ্ছে জন-প্রশাসন খরচ হিসেবে, যে কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়ন করতে হয় দেশি-বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে যা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রস্তাবিত ৯২,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫২৩০ কোটি টাকা যা মোট রাজস্বের প্রায় ৮২% এবং বিগত বছরগুলোতেও একই ধারা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং আমরা মনে করি সরকারের রাজস্ব ব্যয় পর্যালোচনা করা উচিৎ এবং এ খাতে খরচ কমিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের পরিমাণ বাড়ানো উচিৎ।

তথ্য সুত্রঃ

- *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১২*
- *জাতীয় বাজেট ২০০৯, ২০১২-১৩*
- *গবেষণা সংক্ষিপ্তসার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ, টিআইবি*
- *বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের তথ্যসমূহ*
- *দৈনিক সংবাদপত্রের বিভিন্ন তথ্যসমূহ*
- *এনবিআর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১*
- *জাতীয় ভ্যাট আইন ২০১২*
- *Incidence of income taxation in Bangladesh, Tapan K Sarker*
- *Tax and Development "A News letter of "Tax Justice Network"*
- *A Panel Study on Tax Effort and Tax Buoyancy with Special Reference to Bangladesh*
- *Flow of External Resources into Bangladesh.*
- *Is VAT Regressive? "An analysis of Institute of Fiscal Studies"-UK*
- *Addressing Regional inequality and Bangladesh Public Expenditure, CPD*

সচিবালয়ঃ

ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩/৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ৮৮-০২-৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org

যোগাযোগঃ

সৈয়দ আমিনুল হক, *মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, ইমেইল: ধসরহঁষ@পড়ধংঃনফ.ড়ৎম*
রেজাউল করিম চৌধুরী *মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, ইমেইল: ৎবুধ@পড়ধংঃনফ.ড়ৎম*